–বিকাশবাবু–

(প্রথম তরঙ্গ) (দ্বিতীয় তরঙ্গ) (তৃতীয় ও শেষ তরঙ্গ)

সম্প্রতি নিজের মধ্যে বিকাশবাবুকে আবিষ্কার করছি বারবার।

তাতে আশ্চর্য হবার কী আছে? বিকাশবাবু, বিকাশ রায়, আমার বাবা। জন্ম: ষোলোই মে, ১৯১৬, মৃত্যু: ষোলোই এপ্রিল, ১৯৮৭। একাত্তর বছরের জীবন, তার অর্ধেকের বেশী কেটেছে বাংলা বিনোদন জগতে, মুখ্যত অভিনেতা হিসেবে। এছাড়া চিত্রনাট্য, পরিচালনা, প্রযোজনা ইত্যাদি অন্যান্য কাজও করেছেন। আর তার থেকেও বেশী সময় কেটেছে আমার বাবা হিসেবে। আমার কাছে পিতা বিকাশবাবু অভিনেতা বিকাশবাবুকে হারিয়ে দিয়েছেন বরাবরই। এ প্রতিযোগিতার কথা নয়, নয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা, ঈর্ষ্যা তো নয়ই। বিকাশবাবু নিজে যে সেইটাই চাইতেন, নিজেই আমাকে সে কথা বলেছেন, তাঁর ব্যবহারও সেই সাক্ষ্যই দেয়। দেখা যাক।

ছবিতে যোগ দেবার আগে বিকাশবাবু রেডিয়োতে কাজ করতেন, নাটক করা ও করানোর অভ্যাস ছিলো। এভাবেই চলছিলো, কিন্তু বিকাশবাবুর মতে উনিশশো চুয়াল্লিশ সালে বাংলা ছবির জগতে এক যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে। নিউ থিয়েটার্সের ' উদয়ের পথে ' ছবিটি মুক্তি পায়, সেই ছবিতে এক মণিকাঞ্চন, কিংবা নবরত্ন, সমাহার ঘটেছিলো। জ্যোতির্ময় রায়ের কাহিনী ভিত্তি করে বিমল রায় পরিচালনা করেন ছবিটি, রাধামোহন ভট্টাচার্য ছিলেন নায়ক, বিনতা বসু (পরে রায়) নায়িকা। একটি সম্পূর্ণ নতুন ধরণের ছবি, নতুন ধরণের কাহিনী, সংলাপ, পরিচালনার ধারা, অভিনয়ের সৌকর্য, এবং বেশীর ভাগ কুশীলবেরা নতুন ধরণের মানুষ। ছবিটি অভূতপূর্ব বাণিজ্যিক সাফল্য লাভ করেছিলো, তাতে প্রমাণ হয় যে বাঙালী দর্শকরাও এ ছবিতে ভালো লাগার মতো অনেক কিছু পেয়েছিলেন।

' উদয়ের পথে ' ছবিটি প্রমাণ করলো যে চিন্তাশীল দর্শকদের জন্য তৈরী ছবি করেও লাভ করা যায়, এবং সেই প্রমাণে ভরসা পেয়ে ছবির জগতে যোগ দিতে এলেন অনেক নতুন লোক, পরীক্ষা–নিরীক্ষা করতে এলেন অনেক চিন্তাশীল শিল্পী। যুগান্তকারী এই অর্থে। এই সময় থেকে বাংলা ছবির চালচলন, বাংলা ছবির পালা বদলের কাল হোলো শুরু। এই জ্যোতির্ময় রায়ের দাক্ষিণ্যে বিকাশবাবুর চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ ১৯৪৭ সালে, ছবির নাম অভিযাত্রী, পরিচালনা করেছিলেন হেমেন গুপ্ত। হেমেনবাবুর সঙ্গে বিকাশবাবুর পরিচয় সুফলপ্রসূ হয়েছিল অনেকভাবে, বিশেষত বিকাশবাবুর পক্ষে। এই পরিচয়ের সূত্র ধরে বিকাশবাবু পরে ছবি করেছেন ' ভুলি নাই', এবং তারও পরে ' '৪২'। আমাদের কালের লোক যাঁরা, যাঁরা ' '৪২' ছবিটি দেখেছেন, তাঁদের অনেকের মতে ঐ ছবিতেই বিকাশবাবুর শ্রেষ্ঠ অভিনয়। তাছাড়া এই ছবি দুটিতেই হেমেনবাবুর সহকারী পরিচালক হিসেবে বিকাশবাবু ছবি করার কলাকৌশল শিখলেন এবং একই রকম চিন্তাধারার কিছু অভিনেতা–অভিনেত্রীকে ছবিতে নামালেন, রিক্রুট করলেন আর কি, যথা মঞ্জু দে।

বাংলা ছবির জগত তখন কেমন ছিলো? আমার জানার কথা নয়, পরে মায়ের কাছে শুনেছি। ছবিতে নামার আগে বিকাশবাবু অবশ্যই স্ত্রীর অনুমতি নিয়েছিলেন। সেটা খুব কঠিন হয়নি, কেননা বিকাশবাবু এবং তাঁর স্ত্রী সব ব্যাপারেই পরস্পরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস রাখতেন। আমরা ছেলেমেয়েরা বলতাম নিরবচ্ছিন্ন মধুযামিনী, neverending honeymoon, বিকাশবাবু নিজে বলেছেন যে তাঁরা made for each other. তবে আমার তিন সন্ধ্যা সন্ধ্যাহ্নিক করা ঘোর প্রাচীনপন্থী ঠাকুরদা তখন জীবিত, তিনি মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ''হ্যাঁ মা, বিকু যে ছবি করতে যাবে, তোর মত আছে তো? এ লাইনটাই শুনেছি অতি খারাপ, লোকে মদ্যপান, কুসংসর্গ ও অন্যান্য কুকর্মে জড়িত হয়ে পড়ে, সংসার উচ্ছন্নে যায়। তুই সামলাতে পারবি তো?'' মা অবশ্যই এসব জানতেন, আগেই বিকাশবাবুকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে নিয়েছিলেন। আর ঐ যে বললাম না, কর্তার ওপর তাঁর বিশ্বাস ছিলো অগাধ। বিকাশবাবু সারাজীবন তাঁর এক এবং অনন্যার কছে কথা রাখার চেষ্টা করে গেছেন, বিফল হয়েছিলেন বলে খবর পাইনি। ঠাকুর্দা বৃদ্ধ বহুদর্শী, খুব একটা ভুল বলেন নি। যা রটে তার কিছু তো বটে!

created using
BCL easyPDF
Printer Driver
Click here to purchase a license to remove this image

এই পরিবেশে চিত্রজগতে বিকাশবাবুর প্রবেশ। এ পরিবেশকে কিছু বদলাবার প্রাণপণ চেষ্টা করে গেছেন সারাজীবন -- শেষবয়সে নিজেই মনে করতেন যে খুব একটা সফল হতে পারেননি। ক্রমশ প্রকাশ্য। অভিনেতা হিসেবে বিকাশ রায়ের অবদান নিয়ে আমার পক্ষে কিছু বলা বাতুলতা, আমি জানি যে সে আলোচনা পক্ষপাতদুষ্ট হবে। তবে একটু ভূমিকা করে একটা কথা বলি। ভূমিকাটি এই। ১৯৫০ সালে সিগনেট প্রেস থেকে একটি পত্রিকা বেরোয়, নাম 'চলচ্চিত্র'। সম্পাদকমণ্ডলীতে তখনকার উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক সমাবেশ। সেখানে তাঁরা তখনকার কিছু নতুন, কিছু পুরনো অভিনেতা–অভিনেত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথা লেখেন। বিকাশবাবু সম্বন্ধে তাঁদের লেখা (লেখকের নাম নেই, রাধাপ্রসাদ গুপ্তের লেখা বলে শুনেছি) থেকে উদ্ধৃতি দিই :

'বিকাশবাবু যে জাতের, যে রুচির, যে মহলের লোক আজকের বাংলা চিত্র জগতে তাঁদের সংখ্যা বেশী নয়। আমাদের নিজেদের দিশি ছবির বিশিষ্ট ভাষা গড়তে পারব, সগৌরবে তুলে ধরতে পারবো পৃথিবীর সামনে। এবিষয়ে নতুন পথের সন্ধান যাঁরা দিতে পারবেন, আমরা আশা করি বিকাশ রায় তাঁদের মধ্যে একজন।'

আমার বিশ্বাস বিকাশ রায় এঁদের এই আশা পূর্ণ করতে পেরেছিলেন। সাঁইত্রিশ বছরে বিকাশবাবু আন্দাজ প্রায় তিনশোর কাছাকাছি ছবি করেছেন। তার কিছু খুব ভালো, কিছু খুব খারাপ, বাকী হয়তো মাঝামাঝি -- এর মধ্যে আহামরির কিছু নেই। আমি জানি যে বিকাশবাবুর আগে এবং পরে বাংলা ছবির অভিনয়ে নতুন পথের দিশারী অনেকে এসেছেন । কিন্তু আমি এবিষয়েও নিঃসন্দেহ যে হেমেন গুপ্ত, জ্যোতির্ময় রায়, রাধামোহন ভট্টাচার্য আদি পথিকৃৎদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাংলা চলচ্চিত্রকে নিছক পৌরাণিক বা স্বাদহীন সামাজিক ছবির মামুলিত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া, নতুন পথ দেখানো, নতুন লোকদের আনার ব্যাপারে বিকাশবাবুর অংশ বেশ বড়ো।, ছোটো নয় তাঁর অবদান। আমার এও বিশ্বাস যে বাঙালী চট্ করে সে কথা ভুলে যায়নি, যাবেও না।

উনিশশো চৌষট্টি সালে দেশ ছাড়ার আগে পর্যন্ত বিকাশবাবুর সব ছবি আমি আর আমার মা দেখতে যেতাম। তখন সব বাংলা ছবিই সপরিবারে দেখা যেতো। মাঝে এক সময় বিকাশবাবু খল নায়কের ভূমিকায় বেশ নাম করে টাইপকাস্ট হতেন এবং তাঁর অভিনীত চরিত্রটি ছবির শেষদিকে মারধোর বা অন্যভাবে লাঞ্ছিত হোতো। আমার ছোটো বোন ছিলো বাবার আদুরে মেয়ে, বাবাকে মারধোর করবে, হোক না সে পর্দায়, এটা তার পছন্দ হোতো না তাই সে আর আসতো না। আমরা বলতাম আদিখ্যেতা। সত্যি বলতে কি, বিকাশবাবুর সব ছবিই আমার ভালো লাগতো তখন, নিশ্চয় অপরিণত বয়স আর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে। তারপর আমেরিকায় চলে এলাম, বহুদিন বিকাশবাবুর কোনো ছবিই দেখা হোলো না। তখন ভিডিও প্লেয়ারের চল ছিলো না। চৌষট্টির পরেও বিকাশবাবু বেশ কিছু ভালো ছবি করেছিলেন বলে শুনেছি। ওঁর নিজের মতে 'আরোগ্য নিকেতন' ছবিটি অভিনেতা হিসেবে ওঁকে সবচেয়ে বেশী তৃপ্তি দিয়েছিলো, সেটাও দেখা হয়নি। এখন অবশ্য বিকাশবাবুর অনেক ছবি ক্যাসেটে পাওয়া যায়, কিন্তু এখন আর ওঁর ছবি দেখতে পারিনা, বড়ো কষ্ট হয়। সোজা কথায়, ওঁকে মিস করি বড্ডো। সেই বাচনভঙ্গী, তর্জনীসঙ্কেত, অভিব্যক্তি, এ ছিলো আমার খুব চেনা এবং খুব প্রিয়। আসলে মানুষটাই ছিলেন আমার খুব কাছের লোক। দূরে চলে গেছেন, এটা মনে করিয়ে দিতে ইচ্ছে হয় না। জীবনের শেষপ্রান্তে আসা প্রৌঢ়ের পক্ষে এটা হয়তো বাতুলতা, তবে অন্যান্য অনেক চরিত্রগত দুর্বলতার সঙ্গে এটিকেও স্বীকার করে নিয়েছি।

শুধু অভিনয়েই আটকে থাকতে চাননি বিকাশ রায়। প্রথমে কয়েকজন সহকর্মী মিলে ছবি করেন, নাম শুভযাত্রা, মোটামুটি ভালোই চলেছিলো। কিছু পরে নিজের কোম্পানী করে বিকাশ রায় প্রোডাকশন্স্ ব্যানারে বেশ কয়েকটি ছবি করেন। তার কোনোটাই মারাত্মক অর্থকরী হয়নি, কিছু চলেছিলো ভালো, প্রচুর লোকসান দিয়েছিলেন কিছুতে। এ বৃত্তান্ত তাঁর আত্মজীবনীতে (করুণা প্রকাশনীর ছাপা বই 'আমি', এখন আর বোধহয় ছাপা পাওয়া যায় না) বিশদ করে লিখেছেন তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে। অভিনয়ের ক্ষেত্রে যে মুন্সীয়ানা ছিলো, পরিচালনার ক্ষেত্রে তা ছিলোনা এটা একটা কারণ আর ব্যবসাবুদ্ধির সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি হোলো আরেকটি, মুখ্য কারণ বললে ভুল বলা হবে না। তবে এই প্রোডাকশনের ব্যাপারটায় আমাদের ভাইবোনের খুব মজা হোতো, বাড়ীতে তাবড় তাবড় লোক আসতেন সেটা ঠিক, কিন্তু তার থেকেও বড়ো মজা ছিলো যে বাড়ীতে অনেক লোক আসতেন, চিত্রনাট্য পড়তে, মহলা দিতে, গান লিখতে, গানের সুর দিতে। বাড়ী সাজ নিতো উৎসবের। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ মশাই, জ্ঞানবাবু, সুর বসাচ্ছেন বসন্তবাহার ছবির, পনেরো মিনিট ধরে তাঁর যাদুভরা হার্মোনিয়ামে অবিস্মরণীয় রাগমালা বাজলো, এসে দাঁড়ালো আভোগীতে, 'চরণের ধ্বনি শুনে বারেবারে ছুটে যাই'। মাস্টারমশাই থাকতে আমাদের ওঘরের ধারেকাছে যাওয়া বারণ, আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করছি কী করে তাঁকে ভোগা দিয়ে ভাগানো যায়। সূর্যমুখী ছবিতে 'আকাশের অস্তরাগে' গানটি খুব জনপ্রিয় হয়েছিলো, হেমন্ত মুখার্জী মশায় তার সুর দিচ্ছেন বাইরের ঘরে ফরাসে বসে। 'বৌদি, ''তুমি কী দেখেছো প্রিয়, কৃষ্ণচূড়ার ফুলে বনানী গিয়েছে ছেয়ে'' গানটা মনে পড়ছে? এবার শুনুন আকাশের অস্তরাগে, কী কেমন লাগছে? আহা মিউজিকটা শুনুন, তবে তো'। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার সবে রচনা করে এনেছেন মরুতীর্থ হিংলাজ ছবির সাড়াজাগানো গান 'তোমার ভুবনে মাগো এত

created using BCL easyPDF Printer Driver
Click here to purchase a license to remove this image

পাপ'। সেই বাইরের ঘরে আবৃত্তি করে শোনাচ্ছেন পাহাড়ী সান্যাল, উত্তমকুমার, অনিল চ্যাটার্জি ও আরও অনেককে। পড়া শেষ হয়ে গেলো, সকলে রুদ্ধবাক, কিছুক্ষণ পরে পাহাড়ী জেঠু গলা ঝাড়া দিলেন, ' ওরে তুই একী শোনালি, আবার বল, আবার বল, তোকে কী ইনাম দিতে পারি আমরা'।

বিকাশবাবু যখন শেষমেষ নিজে ছবি করা বন্ধ করে দিলেন, তখন তাঁর সিদ্ধান্তটির যাথার্থ্য পুরোপুরি বুঝলেও ঐ উৎসবের কথা ভেবে মন খারাপ হয়ে যেতো। কেন শেষ করেছিলেন জানতাম, কেন শুরু করেছিলেন, সে কাহিনী অনেকদিন পর জানতে পারি বসন্ত চৌধুরী মশায়ের কাছে। ছবিতে অভিনয় করতে গিয়ে নানা ধাঁচের প্রযোজক-পরিচালক দ্বারা চালিত হতে হয়, তাঁদের একজনকে বিকাশবাবু বলেছিলেন (আমার মনে হয় বলতে বাধ্য হয়েছিলেন; রূঢ়ভাষী হতে পারতেন কিন্তু প্রকৃতি উগ্র ছিলো না) যে ' আমার থেকে বেশী মূর্খের অধীনে কাজ করতে পারবো না'। এবং সমস্ত ঘটনাটায় তিক্তবিরক্ত হয়ে নিজেই ছবি করার কথা ভাবতে থাকেন। কাজটা ঠিক করেছিলেন বা ভুল করেছিলেন, সেটা যাচাই করার সাধ বা সাধ্য আমার নেই, তবে এধরণের কথা আর ভাবনা আজকের প্রথম সারির এক অভিনেত্রী-পরিচালিকার কাছেও শুনেছি। যাঁরা মার্লোন ব্র্যাণ্ডোর আত্মজীবনী পড়েছেন তাঁরা ব্র্যাণ্ডোর বয়ানেও এই কথা শুনেছেন। কাজেই বিকাশবাবুর ব্যবহার শোভন না হোক, সৃষ্টিছাড়া হয়নি। আর ফলং ঐ মোচ্ছবের অভিজ্ঞতা যে আমার বার্ধক্য ভরিয়ে রাখলো মধুর স্মৃতিতে, এটাই বা কী কম লাভ!

উনিশশো বাহাত্তরে আমেরিকা থেকে ঘুরে গিয়ে যখন বুঝলেন যে ছেলে আর দেশে ফিরবেনা, তখন স্টেজে অভিনয় করতে আরম্ভ করেছিলেন, যদিও মানুষটা আসলে ছিলেন সিনেমার লোক। খুব একটা খারাপ করেননি বোধহয়, বারো বছর স্টেজে কাজ করেছেন। অবসর নিলেন উনিশশো চুরাশিতে, ফিল্ম বা থিয়েটার লাইনে এর উদাহরণ বিরল। শেষ বয়সে হাঁপানী প্রকট হয়েছিলো, অভিনয় করতেন কিন্তু শারীরিক ক্লেশও পেতেন। আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে, আমাকে আর মাকে ডেকে বললেন, ' দেখো, আমার তো এই কণ্ঠস্বরটুকু ছাড়া দর্শকদের দেবার আর কিছু নেই, কিন্তু গলাটা আজকাল ফ্যাঁসফেসে হয়ে যাচ্ছে। আমার দর্শকদের আমার যা দেওয়া উচিত, তা দিয়ে উঠতে পারিনা, তাঁদের প্রবঞ্চনা করা হচ্ছে, এ ভেবে আমার বড়ো কষ্ট হয়'। জীবনের অসংখ্য ভুলের মধ্যে এই একটা ঠিক কাজ করেছিলাম বলে গর্ব হয়, ঐ সত্তর-ছোঁয়া বৃদ্ধকে বোঝাতে পেরেছিলাম যে উনি নিশ্চিন্তমনে রিটায়ার করতে পারেন, ভরণপোষণের দায়িত্ব আমার। সেই সময়ে কিছু বই লিখতে আরম্ভ করেছিলেন, লেখার পরিকল্পনাও ছিলো, কাজেই অবসরের সময় কাটানো খুব কঠিন হয়নি।

প্রায় চল্লিশ বছরের এক বিরাট ক্যানভাস। প্রশংসা পেয়েছেন, নিন্দাও, অনেক পুরস্কার পেয়েছেন, একটি পুরস্কার পাননি বলে ক্ষোভ ছিলো। সেটি সরকারী স্বীকৃতি, অর্থাৎ পদ্মশ্রী। ক্ষোভের আসল কারণ জানতে গেলে টক দ্রাক্ষাফল ছাড়িয়ে একটু গভীরে যেতে হবে। যাঁরা খবর রাখেন, তাঁরা স্মরণ করতে পারবেন যে সে সময় সিনেমা করাটাকে, অন্তত বাংলা সিনেমা করাটাকে পুরষ্কার দেবার মতো মহৎ কিছু কাজ বলে গণ্য করা হোতো না। বিকাশবাবু বেশী ব্যথা পেয়েছিলেন এইটাতেই। তাঁর ব্রত ছিলো যে এই পেশাটিকে নিছক কৌতূহল আর প্রচার-অপপ্রচারের পাঁক থেকে তুলে অন্যান্য পেশার মতোই ভদ্রসমাজে স্থান দেবার। সে ব্রত সাধারণভাবে সফল হযেছে কীনা জানি না, তবে বিকাশবাবুর জীবদ্দশায় যা করতে চেয়েছিলেন, তা করতে পারেননি, তিনি এটা বিশ্বাস করতেন।

তবে মানুষের ভালোবাসা কুড়িয়েছেন দুহাতে। তাঁর মৃত্যুর আটবছর পরে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী টেলিফোনে বললেন, ' আহা, আমাদের বিকাশবাবু বড়ো সজ্জন লোক ছিলেন'। একথাটি আমার মায়ের দুঃসহ বৈধব্যযন্ত্রণায় শান্তির প্রলেপ দিয়েছিলো মনে পড়ছে। একযুগ পরে, একপুরুষ, চাই কী দুই পুরুষ পেরিয়ে আমাকে এবং আমার পুত্র ও কন্যাকে সে ভালোবাসা আজও উদ্বেল করে তোলে। টিভি ও ভিসিআরের কল্যাণে বিকাশবাবুর অনেক পুরনো ছবি আজকাল দেখা যায়। পরিচিত, স্বল্পপরিচিত, এমনকী অপরিচিত কত লোকে এসেযাচিতভাবে বলে গেছেন, ' বিকাশবাবু আমার খুব ফেভারিট ছিলেন', বা, ' কাল রাত্রে ওঁর অমুক ছবি দেখলাম, ওঁর অভিনয় ভোলা যায় না'।

বিকাশবাবু যেখানে গেছেন সেখানে এই ভালোবাসার খবর পৌঁছে দিতে পারলে ভালো হোতো। আমার কাছে পিতা বিকাশবাবু ছিলেন অভিনেতা বিকাশবাবুর আগে, এ কথা গোড়াতেই বলেছি। দ্বিতীয়স্থানস্থর সূত্রে আমার এই যে প্রাপ্তি, সেটি উপরি পাওনা, অপ্রত্যাশিত, তাই মধুর। বিজয়ী পিতা বিকাশবাবুর কাছে কী পেলাম, 'বড়ো সজ্জন' সেই বিকাশবাবুর কথা বলবো পরের বার।

(দ্বিতীয় তরঙ্গ) (প্রথম তরঙ্গ) (তৃতীয় ও শেষ তরঙ্গ)

created using
BCL easyPDF
Printer Driver
Click here to purchase a license to remove this image

বিকাশ রায় পছন্দ করতেন বিকাশবাবু সম্বোধন, মিস্টার রায়ে ঘোর আপত্তি। ঘোরতর আপত্তি ছেলেমেয়ের মুখে বাবা ডাকে। বাবুজী হলে আহ্লাদে আটখানা, বাবুতেও খুশী। তাই তিনি ছিলেন আমার বাবু, শেষের দিকে মাঝে মাঝে কর্তা বললে মুচকি হাসিও পাওয়া যেতো। শুনেছি বাবুর কর্তাঠাকুরদা বেশ বিত্তবান জমিদার ছিলেন, রায় উপাধিটি সেসব সূত্রে পাওয়া। বাপের মৃত্যুর পর বাবুর ঠাকুরদা বজরা হাঁকিয়ে কোলকাতায় এসে ফুর্তি করে আর বড়লোকের অকালকুষ্মাণ্ডরা সেকালে যা সব কুকীর্তি করতেন সেসব করে জমিদারি ডকে তুলে সাতাশ বছর বয়সে মারা যান, তরুণী স্ত্রীর ঘাড়ে গুটিসাতেক অপোগণ্ডের ভার চাপিয়ে। আমার ঠাকুরদা উত্তরাধিকারসূত্রে পিতৃঋণ পেয়েছিলেন, আর পেয়েছিলেন তিনচার পুরুষের বাবুয়ানি -- আমাদের বরাতক্রমে বাপের দৃষ্টান্ত দেখে ঐ বাবুয়ানির মন্দ ব্যাপারগুলো মোটামুটি এড়িয়ে চলার শিক্ষাও পেয়েছিলেন। সেই বাবুয়ানি যখন বিকাশবাবুতে বর্তালো তখন তার ঝাঁজ মরে এসেছে, তার প্রকাশ তখন গিলে করা পাঞ্জাবী, কোঁচানো ধুতি, বাহারে চটিতে, সবকিছু অনুষ্ঠানকে যজ্ঞিবাড়ির মাপ দিতে, বনেদি মান-অপমানের তরিবতে, আর বিকাশবাবুর বিশেষ দুর্বলতায় -- বিদেশী গাড়ি এবং সিগারেট।

এই অল্প বাবুয়ানি এবং খরচখর্চার ব্যাপারে মুক্তকচ্ছ বেহিসেব। যে পেশায় যখন নিযুক্ত ছিলেন, সে পেশায় তখন আর যাই থাক, বাঁধা মাইনের ব্যবস্থা ছিলো না। কিন্তু এই তুচ্ছ কারণে বাবুর, এবং বাবুর পোষ্যবর্গের অর্থাৎ আমাদের, বাবুয়ানির হেরফের তো আর হতে পারে না। গিন্নিও ছিলেন একই ধাতের, আমার ঠাকুর্দা ছেলে এবং বৌ, দুজনকেই ব্যাচারাম বলতেন, খুব একটা আদরে নয়। কী যাদুতে কর্তাগিন্নি সব ম্যানেজ করতেন, তা আমার জানা নেই. চেষ্টাও করিনি। অবশ্য বাবুয়ানির দৌড় ঐ আগেই যা বলেছি, তার সঙ্গে ফার্পো-গ্র্যাণ্ডে সপরিবারে খাওয়া, একশো টাকার সীটে বসে সার্কাস দেখা, ধার করে ফার্স্ট ক্লাসে হিল্লিদিল্লী ভ্রমণ, এই আর কী। পয়সা ওড়াবার অন্যান্য যে সব সহজ পথ খোলা থাকতো, সেসব পথে বাবুর গতায়াত ছিলো না, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত, অতএব নিজেদের বাবুয়ানি না কমিয়ে অন্য কীভাবে হিসেবী হতে পারতেন, সেই মরা সাপ ও অভগ্ন লাঠির কৌশল জানা ছিলো না আমাদের। কিন্তু ব্যয়সঙ্কোচের প্রথম খাত বলা যেতে পারে যেটিকে, সেটি হোলো বইয়ের, এবং কাগজের,-- দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, বার্ষিক সবরকমের পত্রিকার খরচ।

বাড়ি বলতে আজও যা আমার মনে পড়ে, সে হোলো বই। বই, বই আর বই। আর কাগজ --দৈনিক খবরের কাগজ এবং সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকার ঝাড়। মা মাঝে মাঝে গজগজ করতেন, ঠাকুর্দা আর বাবু মুখে স্মিত হাসি ফুটিয়ে কড়িকাঠ দেখতেন আর সবার অজান্তে কোথা থেকে বই আর কাগজ ঢুকে আমাদের ছোট ফ্ল্যাটের আনাচকানাচ ভরিয়ে ফেলতো। বাবু তখনও বিকাশবাবু হননি, অতো আলমারি কেনার পয়সা হয়নি, কাজেই যেদিন মার ধৈর্যচ্যুতি হোতো সেদিন তারা চটের থলেয় ঢুকে নির্বাসিত হোতো রান্নাঘরের ওপরের কুলুঙ্গীতে। সেই কুলুঙ্গীর পেছনদিকটি ছিলো এক বালকের অকালে পাকার জায়গা। পোকায় কাটা বইয়ের সোঁদা গন্ধে, ছবি দেখে আর পাতা উল্টে দিব্যি কেটে যেতো গ্রীষ্মের দুপুর আর বর্ষার দিন।

তারপর যখন অনেক আলমারি কেনার পয়সা আর রাখার জায়গা হোলো, তখন কৈশোর, তেরোয় পা দিচ্ছি, অর্থাৎ টিনএজার, যদিও আমার কালে আমার দেশে এই টিনএজার ঘটনাটা খুব একটা পাত্তা পেতোনা। বাবু বললেন, বেনুবাবু, এই বইগুলো একটু লিস্টি করে, ভালো করে আলমারিতে সাজিয়ে রাখো তো বাবা, দরকারের সময় কিছু খুঁজে পাইনা। এখন বুঝি সব বাজে কথা, নিজের বইয়ের হদিশ ভালোই রাখতেন, তখন কিন্তু আমার বেজায় ফুর্তি। কর্তার চালাকিটা বুঝুন, এক ঢিলে দুই পাখী মারলেন, ছেলেকে নিজের বদনেশাটি পাচার করা গেলো আবার বইয়ের লিস্ট দেখার ছুতোয় ছেলেকে কিছু শেখাবার আর কিছু গল্প করার সুযোগও করা গেল। সমারসেট মঘম নয় বাবা, মম; সব হোমটাস্ক হয়ে গেছে তো, তাহলে শোনো পল গগ্যাঁর গল্প। এই বইটা পড়ো, ও বইটা পড়ো, এ শুনেছি, কিন্তু, আশ্চর্য, কখনো শুনিনি, ও বইটা পোড়ো না, এ বইটা পড়তে নেই। বড়োজোর, এখনই এ বইটা ঠিক বুঝতে পারবে না। তার এক আশু অপকারিতা হোলো যে সেই অপ্রাপ্তবয়সে যেসব বাঘা বাঘা বই পড়েছি, তাদের সারমর্ম বোঝার বুদ্ধি থাকার কথা নয়, ছিলোও না, আর আজ সেসব পড়া বই আবার পড়তে মন লাগে না। যাক, আমার কাল নিরবধি না হলেও, বইয়ের পৃথিবী বিপুলা, কাজেই পড়ার বইয়ের অভাব হবে না।

আর রবীন্দ্রনাথ, কথায় কথায় রবীন্দ্রনাথ। জানো তো, 'যে পারে সে আপনি পারে, পারে সে ফুল ফোটাতে'; শোনো রবীন্দ্রনাথ কী বলছেন, 'বাঘের বাচ্ছারে, বাঘ না করিনু যদি কী শিখানু তারে'। সেসময়, মাঝেমধ্যে, আমরা শুয়ে পড়ার পরে, খাটের পাশে বসে, বলাকা খুলে, কিন্তু চোখ বন্ধ করে আবৃত্তি, 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে'। আমরা ভাইবোন, দুই কিশোর-কিশোরী ভাবি, এ কেমন ছিরির কবিতা রে বাবা, ওদিকে পর্দার আড়ালে মায়ের আঁচলে চাবির রিনঝিন। আমার বড়োপিসি ছিলেন হেমন্তবালা দেবীর মতো, রবীন্দ্রনাথের সব মিলের কবিতা কণ্ঠস্থ ছিলো তাঁর, শুনেছি ছোটবেলায় বাবুরা ভাইবোনে রবিঠাকুরের সদ্যোপ্রকাশিত গান সোজা তো বটেই এমনকি উল্টো, অর্থাৎ 'রতো নপআ নেজ বেড়ছা রেতো', করে গাওয়াও রপ্ত করেছিলেন। আমি অবশ্য গাইয়ে হিসেবে বাবুকে

created using BCL easyPDF Printer Driver
Click here to purchase a license to remove this image

দেখিনি কখনো, গান ছিলো আমার মায়ের সাম্রাজ্য। দাদামশায় ছিলেন দস্তুরমতো কালোয়াৎ, অবশ্য শখের, তাঁর কাছ থেকে তালিম পেয়ে মা 'সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে' থেকে 'আমি বনফুল গো', চাই কী জ্ঞান গোস্বামীর দুয়েকটা প্রাণঘাতী তানও গুন্‌গুন্ করে গাইতেন।

এই যে বইপ্রীতি, আমার আর বাবুর দুজনের মধ্যে এটিই গড়েছিলো এক অবিচ্ছেদ্য সেতু, যা ছিল খোলা তাঁর জীবনের শেষ পর্যন্ত । এই সেতু পার হয়েই আমরা বাপব্যাটায় যেতাম আরো অন্য কত দেশে, নাটকের দেশে, নাট্যশালার দেশে, মানুষের কথায়, ইতিহাসের দেশে, ধর্মের, বিশেষত তুলনামূলক ধর্মের কথায়, রামায়ণ-মহাভারতের দেশে, রবীন্দ্রনাথের কথায়, বইয়ের দেশে, এবং আরো কিছু বইয়ের দেশে। রাজনীতির কথা নয় বললেই চলে, কেন জানিনা, রাজনীতিতে বাবুর রুচি ছিলো না বলে মনে হয়, যদিও কখনো অশ্রদ্ধার কিছু বলতে শুনিনি। গোড়ার দিকে অবশ্য তিনিই বলতেন, আমি গিলতাম আর হুঁ হুঁ করতাম, তারপর, আস্তে আস্তে ওটা দাঁড়ালো যে আমরা দুজনেই বলতাম আর দুজনেই শুনতাম। এতে তৈরী হোলো একটা পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ক। অর্থাৎ, তুমি যা বলছো তা আমার চিন্তার সঙ্গে না মিললেও, তুমি যখন এটা বলছো তখন মোটেই উড়িয়ে দেবার নয়। অতএব এসো আমরা দুজনের চিন্তাভাবনা ভালো করে ব্যাখ্যান করি, মন দিয়ে শুনি এবং দেখি দুইয়ে মিলে সত্যের আর একটু কাছে পৌঁছনো যায় কীনা। মতান্তর নয়, মতপ্রকাশ, তর্ক নয়, আলোচনা। ব্যবহারিক জীবনে কেমন ছিলেন জানিনা, কিন্তু আমাদের, এমনকী মায়ের সঙ্গে আলোচনার সময়েও দেখেছি এমনতরো চিন্তা -- আহা, ওর দৃষ্টিকোণটাও তো দেখা দরকার।

আমার মতে এক আদর্শ প্রাপ্তবয়স্ক সম্পর্ক, ideal adult relationship। আজ বিশ্লেষণ করে দেখি আর উপলব্ধি করি যে এই সম্পর্কটা হঠাৎ গড়ে ওঠেনি, বাবু বহু যত্নে, অনেক ধৈর্যে, আস্তে আস্তে এটি গড়ে তুলেছিলেন। যখন বয়সের ধর্মে আমার এঁড়ে তর্ক করার স্বভাব তখন, আমার গা-জ্বালানো গোঁয়ার্তুমি সত্ত্বেও তখনও তাঁকে দেখিনি ধৈর্য হারাতে। এরই প্রস্তুতি হিসেবে, ইস্কুল ছাড়ার পর থেকেই পারিবারিক যে কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার আগে আমার মত চাওয়া হোতো। অবশ্যই কোনো মত থাকার মতো বুদ্ধিও তখন ছিলো না, কিন্তু ঐ যে মত চাওয়া হোতো, ছোট বলেই যে নগণ্য, এটা ঠিক নয়, এই আশ্বাসটা পরের কালে চিন্তাগঠনে অনেক সাহায্য করেছে। দুঃখের কথা যে ভালো গুরুর কাছে শিক্ষা পেয়েও নিজের জীবনে এ বিদ্যা আরো প্রয়োগ করতে পারলাম না। এ আমারই অক্ষমতা।

ছোটখাটো দুয়েকটি ঘটনা মনে পড়ে যাচ্ছে। যখন চাকরি শুরু করলাম, তখন বাড়ী ফিরতাম দুজনে মোটামুটি এক সময়ে। স্নান করে, কফি হাতে প্রায়ই আমাদের পাঠের আসর বসতো। 'শেষের কবিতা'টা বার করো হে, ভুলে যাচ্ছি সব। আজ 'ম্যাকবেথ' ধরা যাক, কী বলো। বারান্দায় বড়ো তক্তপোষ, মা মধ্যে মধ্যে বসতেন কোণে, বোন কখনও থাকতো, কখনও থাকতো না। আমার মৎলব কী করে নিজে পড়াটা এড়িয়ে বাবুকে দিয়ে পড়ানো যায়, সুধীজনের মনে পড়তে পারে যে বিকাশবাবুর খ্যাতি ছিলো কণ্ঠস্বরের জন্য। এমনই এক আসর আরম্ভ করে, অনেকদিন পর খোঁজ পড়লো শেক্‌স্‌পিয়ারের, দেখা গেলো পাখা গজিয়েছে ঠাকুর্দার আমলের চামড়া-বাঁধাই কলেক্টেড ওয়ার্ক্‌সের। বিকাশবাবুর মত, বাড়ীতে 'সঞ্চয়িতা' আর 'শেক্‌স্‌পিয়ার' না থাকলে সে বাড়ী শিক্ষিত বাঙালীর বাড়ীই নয়। অতএব, রাত আটটায় গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে, ধর্মতলার বইওয়ালার অবসরে ব্যাঘাত করে 'শেক্‌স্‌পিয়ার' কেনা হোলো, বাঙালীর বাড়ী আবার শিক্ষিত হোলো, তবে শান্তি। এমনই এক উড়ুক্কু 'ছিন্নপত্রে'র সন্ধানে গিয়ে আবিষ্কার যে সে বই ছাপা পাওয়া যাচ্ছে না। যে বইতে আধুনিক বাংলা গদ্যের জন্ম, যে ভাষায় আজ কথা বলছি, সে ভাষার শুরু যে বইতে তা ছাপা নেই, এ বাঙালীর দুরপনেয় কলঙ্ক। অতএব, গাড়ী বার করো, চলো বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের আপিসে। চেকবই বাগিয়ে, 'আমি যদি নিজস্ব পুঁজি থেকে টাকা দিই, তাহলে আপনারা এ বই ছাপবেন?' শেষ পর্যন্ত তা করতে হয়নি, আর আমার তখন বয়োপ্রাপ্তদের এই উন্মাদ ব্যবহারে সঙ্কুচিত হবার বয়স, পালাতে পারলে বাঁচি। আজ অবশ্য মনে হয় এরকম কিছু উন্মাদ থাকাটা খারাপ নয়, তাতে জীবনযাত্রায় উৎকর্ষ না আসুক, মামুলিত্বের কিছু লাঘব হয়।

তারপর আমেরিকায় চলে এলাম, নিয়মিত চিঠিপত্রে আমার আমেরিকাদর্শনের গল্পই থাকতো বেশী, বইয়ের কথা কম। শোধ তোলা হোতো তিন-চারবছর পর দুসপ্তাহের ছুটিতে যখন দেশে ফিরতাম। গড়িয়াহাট রোডের ওপর ফ্ল্যাট, ভোর পাঁচটা থেকে বজ্ররবে বাস চলাচল করে, ঘুম ফেরারী। অতএব ছটার থেকে বেলা দুটো অবধি আমাদের নিরবচ্ছিন্ন আড্ডা, মা ঠিক সময়মতো কফি জুগিয়ে যাচ্ছেন, মাঝে মাঝে নীরব, কিন্তু ভারী সমঝদার শ্রোতা, আর আমরা বাপব্যাটায় সাহিত্যের, এবং সেই ছিদ্রপথে নাটক-গান-ফিল্ম-খেলা-নতুন লোক-পুরনো লোকের রাজা-উজীর মেরে যাচ্ছি। তখন নিজের বই কেনার নেশা ধরেছে -- বিকাশবাবুর বই ধার নিয়ে আসারও সাহস ছিলো না, ইচ্ছেও না। কর্তার তখন কাজ ছিলো ছেলেকে সাম্প্রতিক ভালো বাংলা বইয়ের হদিশ বাৎলানো। কলেজ স্ট্রীটের দাশগুপ্ত বইয়ের দোকানের মালিক অমূল্যবাবু ছিলেন আমার জ্যাঠামণির সহপাঠি, অর্থাৎ তখন প্রায় পঞ্চাশাধিক বছরের জানাশোনা। এর মধ্যে দুতিনসন্ধ্যা আমাদের দাশগুপ্ততে হানা। শেষদিকে বাবুর কয়েকটা বইও ছাপা হয়েছিলো, সেই সূত্রে আরো কয়েকটি বইয়ের দোকানে যাওয়া।

created using BCL easyPDF Printer Driver
Click here to purchase a license to remove this image

চুরাশি সালে বাবু অভিনয়ের জগৎ থেকে অবসর নিলেন। তখন নিজের কয়েকটা বই ছেপেছেন এবং বই লিখতে ভালোও লাগছে। এরপর উনি শারীরিক সুস্থ থাকতে থাকতে আর একবারই দেখা হয়েছিলো। তখন অন্যে কী লিখলেন, সে কথার থেকে বেশী কথা হয়েছিলো নিজেদের লেখার কথা নিয়ে, পরিকল্পনা ছিলো আমরা বাপব্যাটায় রবীন্দ্রনাথের ওপর কিছু লিখবো -- তিনচারটি বিষয় ঠিক হোলো, ভেবেচিন্তে মূল বক্তব্যের খসড়া তৈরী করার হোমটাস্ক নিয়ে চলে এলাম। তারপর বাবুর প্রাণাধিকা কন্যা, আমার বোন, আমাদের নন্দিনী হঠাৎই চলে গেলো। এবং বরাবরের একগুঁয়ে বিকাশবাবু কারো কথা না শুনে এক বছরের মধ্যে মেয়ে যেখানে গেছে সেপথে পাড়ি দিলেন। সাড়ে উনপঞ্চাশ বছরের জীবনসঙ্গিনীকে রেখে গেলেন সাড়ে উনষাট বছর ধরে জমানো বইয়ের পাঁজার তত্ত্বাবধান করতে। কর্তার পছন্দ-অপছন্দ গিন্নির নখদর্পণে, গিন্নি তাই আরো দশবছর কোলকাতার ধুলো ঝেড়ে আর পোকার সঙ্গে কুস্তি করে একদিন গেলেন খেপে। 'আমার ঘাড়ে এই ভূতের বোঝা চাপিয়ে নিজে দিব্যি মেয়ের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছেন, দাঁড়াও আমিও আসছি', এই বলে, কর্তার মতামত নিয়ে (রাত্রে সবাই শুয়ে পড়লে গিন্নি কর্তার সঙ্গে সুখদুঃখের কথা বলতেন, এটা আমাকে চুপিচুপি বলেছিলেন) কর্তার এতো সখের বইগুলিকে যাঁরা যত্নে রাখবেন, বাংলা সাহিত্যজগতের তেমন দুই দিকপালকে ডেকে বারোআনা বইয়ের সদ্গতি করলেন। তারপর ভারমুক্ত হয়ে নিজেও চলে গেলেন চিরস্থায়ী মধুচন্দ্রিমার এই বেয়াড়া ফাঁকটা পূরণ করতে।

যা থেকে গেলো তা হোলো স্মৃতি, মধুস্মৃতি। তাতে ধুলোও পড়ে না, পোকাও লাগে না, নিয়মিত একটু নাড়াচাড়া করলে দুঃখের নির্মোক খসে গিয়ে যেন আরো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মন্দ কী! এদিকে আমারও হোমটাস্ক আছে, আর আছে সম্প্রতি প্রকাশিত পাঠযোগ্য বইয়ের তালিকা করার কাজ। এবার তো আমার পালা বাবুর কাছে সেই তালিকা দাখিল করবার!

(তৃতীয় ও শেষ তরঙ্গ) (প্রথম তরঙ্গ) (দ্বিতীয় তরঙ্গ)

বিকাশবাবু পেশায় ছিলেন অভিনেতা, যদিও প্রায় চল্লিশ বছরের কর্মজীবনে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অনেক কাজেও জড়িত ছিলেন। যশ আর খ্যাতির হিসেব নিলে তাঁকে পেশাদার বলা যায়। ইংরেজী professional কথাটা আরো ভালো শোনায়।

কিন্তু এই পেশাটি তাঁকে বেশ চিন্তিত, বিব্রত ও ব্যথিত করেছিলো, এটা আমি জানি। ঠিক যে পেশা নিয়ে এই সংশয় তা নয়, অপছন্দের জীবিকা যে অতি পীড়াদায়ক, বিকাশবাবু সেটা না বোঝবার মতো মূর্খ ছিলেন না। যেটা নিয়ে তিনি বিশেষ দোলায়মান ছিলেন সেটা হোলো এই পেশার জগৎটিকে নিয়ে, সেই জগতের বাসিন্দা মানুষদের এবং বাইরের আরো বড়ো সংসারে সেই জগৎটির স্থানটিকে নিয়ে। বিকাশবাবু দার্শনিক ছিলেন না, নন্দনতত্ত্ব চিন্তার ভার পণ্ডিতদের থাকুক, তাঁর চিন্তা ছিল সেই স্থানের, সেই কালের, অর্থাৎ সেই চার দশকের সেই পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্রশিল্পকে নিয়ে।

আমরা যখন বড়ো হয়েছি তখন এই ছবি বা নাটকের ব্যাপারটাকে লোকে খুব একটা ভালো চোখে দেখতো না। এই জগৎ এবং তার বাসিন্দাদের নিয়ে কৌতূহল ছিলো প্রচুর, পুরনো এবং সদ্য গজিয়ে ওঠা সিনেমার পত্রিকাগুলো সেই আগুনে সমিধ জুগিয়ে বেঁচে থাকতো, এটাই নিয়ম। গন্ধর্বদের কাহিনী, অমিতাচার আর উচ্ছৃঙ্খলতার কাহিনী, সব মিলিয়ে এক নিষিদ্ধ জগতের কথা, পড়তে ভালো লাগে, ভালো লাগে দূর থেকে দেখতে, ফিস্‌ফিস করে গল্প করতে, কিন্তু ভয় হয় কাছে আসতে দিতে। এদেশে বলে you will not want your sister to marry one! ছবি করতে যাবার জন্য ত্যাজ্যপুত্র হয়েছেন এমন বিশিষ্ট অভিনেতার গল্প আপনারা সবাই জানেন। অভিনেত্রীদের কথা আর উল্লেখ নাহয় নাই করলাম।

এই প্রেক্ষাপটে সমাজতত্ত্ব-নৃতত্ত্বের অনেক গবেষণার উপাদান রয়েছে, এবং নিশ্চয় হয়েছে, কিন্তু আমি বসেছি বিকাশবাবুর কথা বলতে। বিকাশবাবুর প্রথম সমস্যা ছিলো কেন অভিনয়আদি পেশা অন্য যে কোনো পেশার, তা সে হোক না প্রযুক্তি, আইন, চিকিৎসা এমনকি করণিক, সমতুল হতে পারবেনা! কাজের এক জগৎ থাকবে তো বটেই, আর থাকবে কাজের বাইরের আরেক জগৎ, সেটাই মুখ্য, সেখানে সবায়েরই সামাজিক সত্তা, পিতা, ভ্রাতা, সন্তান, স্বামী, নাগরিক। সেখানে সম্মানের আসন, অবশ্যই কর্মক্ষেত্রের সাফল্য কিছু মাত্রায় সে আসনের উচ্চতার নির্ধারক। এই যে চলচ্চিত্র বা নাটকের লোকেরা -- বিকাশবাবুর ভাষায় নোটোরা -- সেইখানে নিছকই কৌতূহলের পাত্র হয়ে থাকেন -- বিকাশবাবুর ভাষায় চিড়িয়াখানার জন্তু -- এটা তাঁকে পীড়া দিতো খুব। আমি যখন বিইকলেজে পড়ি তখন সেখানকার ছাত্র পরিষদ কোন উৎসব উপলক্ষ্যে বিকাশবাবুকে সভাপতি করে এনেছিলেন (সঙ্গে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন প্রধান অতিথি), সেই আনন্দের কথা বিকাশবাবুর স্মরণে ছিলো আমৃত্যু। যতদূর মনে পড়ে সভাপতির ভাষণে এ কথা উল্লেখও

created using
BCL easyPDF
Printer Driver
Click here to purchase a license to remove this image

করেছিলেন। এখন অবশ্যই সে অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে, এদেশে তো আমরা একজন অভিনেতাকে রাষ্ট্রের পুরোধা নির্বাচন করেছিলাম, একবার নয়, দু দুবার, আরেকজনের গভর্ণর পদে নির্বাচন নিয়ে হুলুস্থুলু এখনও থিতিয়ে যায়নি। দেশেও শুনেছি তাঁরা বিধানসভায়, রাজ্যসভায় নির্বাচিত হযেছেন, অনিল চ্যাটার্জি মশায় তাই করেছিলেন বলে জানি। সরকার থেকে তাঁদের নানারকম সম্মানও দেওয়া হয় আজকাল।

কিন্তু তখন হোতো না। এবং এজন্য বিকাশবাবু চিত্রজগতের লোকেদেরই দোষী এবং দায়ী -- দুইই করতেন। দোষী, কেননা, অমিতাচারের অপবাদ অতিরঞ্জিত হলেও কিছু সত্যের ভিত্তি তো ছিলো। দায়ী, কেননা বিকাশবাবু মনে করতেন এই সম্মানটা আদায় করে নেবার দায় চিত্রজগতের লোকেদেরই ভাগে অর্শেছে, পাঁকের পদ্মকেই পদ্মত্ব জাহির করতে হবে। প্রথমটার প্রতিবিধান করতে চেয়েছিলেন নিজের জীবন আর জীবনযাত্রায় একটা দৃষ্টান্ত রেখে। মদ্যপান করতেন না বলেই প্রচার ছিলো। যে পঁচিশ বছর তাঁর সঙ্গে এক বাড়ীতে বাস করেছি, সেসময়ে এ তথ্যে সন্দেহ প্রকাশের কারণ দেখিনি কোনো। লাম্পট্যের অপবাদ তো কখনোই শুনিনি -- স্ত্রৈণ আখ্যা বেশ গৌরবের সঙ্গে বয়ে বেড়াতেন। আশ্চর্য যে, একসময়ে খলনায়কের ভূমিকা করে নাম করেছিলেন, অনেকেই বিশ্বাস করতেন যে আসল মানুষটার চরিত্রও অমনই হতে হবে। রায়পরিবারের আমরা তখন এসব হেসে উড়িয়ে দিতাম, না দিলে মিথ্যে হলেও নিন্দের তীব্রতায় গায়ে ফোস্কা পড়তে পারতো। অনেকদিন পরে আমার এক ঘনিষ্ঠ কনিষ্ঠের কাছে শুনেছি যে আমি পরীক্ষায় জলপানি পেয়েছি জেনে তার বাবা তাকে বলেছিলেন যে অমন দুশ্চরিত্র বিকাশ রায়ের ছেলে যদি জলপানি পায় তবে সেই বা কেন পরীক্ষায় ভালো করতে পারবেনা। দুই কুশীলবই অবশ্য তখন গতাসু। ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার আগে কর্তা খুব কাঁচুমাচু মুখে বললেন, বেনুবাবু, এবারেও একটা কিছু হবে তো, লোকে বলছে যে স্কুল ফাইনালের জলপানিটা নেহাৎই বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়া। একক ভাবে দেখলে প্রাণঘাতী কিছু নয়, তবে নিত্যসেবনে আত্মসচেতন ব্যক্তির যন্ত্রণাকর মর্মদাহ হতে পারে। বিকাশবাবুকে সেবার খুসী করা গিয়েছিলো।

ফলম্, চিত্রজগতের লোকদের নিয়ে অহেতুক ও অশোভন কৌতূহল প্রকাশ নিষিদ্ধ ছিলো আমাদের বাড়ীতে। যেমন ছিলো তাঁদের যথেষ্ট সম্মান না দিয়ে ডাকা। উত্তম নয়, উত্তম কাকা, যেমন ভানু কাকা, পাহাড়ী জ্যেঠু, হেমন্তকাকা বা মিসেস সেন, মিসেস সুচিত্রা সেন। বাবু যদি ফিল্ম্ লাইনে কাজ না করে অন্য কোনো পেশায় নিযুক্ত থাকতেন, তাহলে তাঁর সহকর্মীদের যা বলে ডাকতাম, এখানেও তার ব্যত্যয় হবার জো ছিলো না। তখন পশ্চিম বঙ্গের চিত্রজগৎটা ছোটো ছিলো, যেমন ছোটো ছিলাম আমরাও, সবাই সবাইকে চিনতেন, উৎসবে পার্বণে যাতায়াত ছিলো, কাজেই কাকা-জ্যেঠা-মাসী-পিসী খুব সহজেই আসতো এবং তাঁরাও স্নেহে-আদরে মিষ্টি কথায় এই প্রথাটাকেই বেশী ভালো লাগতে শিখিয়েছিলেন।

ছিলোনা ছবি করাটাকে ছেলেমেয়ের পেশা করায় বা ঘটতে দেওয়ায় এতটুকু উৎসাহ। সেটা পেশার প্রতি তুচ্ছভাব থেকে নয়, বিকাশবাবু বিশ্বাস করতেন এটি অত্যন্ত কঠিন পেশা, এখানে পারিশ্রমিক পরিশ্রমের মাপসই নয়, সাফল্যের শীর্ষপথ অতি বন্ধুর, ব্যর্থতার গহ্বর পাতালগামী। অপত্যস্নেহ বলতে পারেন, আমরা একদিকে যেমন চাই আমাদের ছেলেমেয়েরা আমাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করুক, অন্যদিকে তেমনি চাই ' আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে '। বিকাশবাবুর বিশ্বাস ছিলো এই যে যাঁরা সফল অভিনেতা-অভিনেত্রী হন, তাঁদের শিখতে হয় নিজেদের অনুভূতি নিয়ে খেলা করতে। এই শটে আমি শ্মশানে, স্ত্রীর শেষ কাজ করছি, কাট্, দৃশ্য পরিবর্তন, দশ মিনিটের মধ্যে আমার বাসরঘরের দৃশ্য। যাঁরা ভালো অভিনয় করেন, তাঁদের মাথায় একটা ছোটো সুইচ আছে, সেটি টিপতে জানতে হয়। প্রাকৃতিক নিয়মকে কলা দেখিয়ে, প্রকৃতির সঙ্গে ছেলেখেলা। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর এই খেলায় হেরে গিয়ে প্রকৃতিও তাঁর প্রতিশোধ নেন, আস্তে আস্তে আসল-নকলের প্রভেদবোধটা ঘুচিয়ে দিয়ে। মঞ্চের টিনের তলোয়ার আর রাংতার মুকুটে তাঁরা বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেন, আর এ শিল্পের চলতি প্রথাই হোলো সমস্ত ব্যাপারটাকে প্রচারের রাংতায় মুড়ে রাখা। এদেশে যাঁরা মেথড এ্যাক্টিং শেখেন, -- অভিনীত চরিত্রের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত করার কৌশল এই ধারার একটি মূল মন্ত্র -- শুনেছি গুরুরা তাঁদের এ বিষয়ে সদা সতর্ক থাকতে বলেন।

বিকাশবাবু ভাবতেন যে এর প্রতিষেধক হতে হবে এমন, যা জীবনে দেবে আর এক ভরকেন্দ্র, টানবে এক গণ্ডী, যে গণ্ডীর এধারে অভিনেতৃকুল সাজা রাজা নন, সত্যিকারের মানুষ, সেখানে ঐ রাংতা জগতের অনুপ্রবেশ নিষেধ। এবং বিকাশবাবু খুব সহজ রাস্তা নিয়েছিলেন এখানে -- এই অন্য জগৎটি হোলো তাঁর পরিবার, যেখানে তিনি পিতা, ভ্রাতা, স্বামী ,সন্তান। তাই আমাদের বাড়ীর অলঙ্ঘনীয় নিয়ম ছিলো আমাদের চারজনের একসঙ্গে নৈশাহার, সারাদিনের ঘটনার গল্পগুজব করে, বাবু-মার সঙ্গে কৌতুক করে, খুকুর সঙ্গে খুনসুটি করে তার বেশীর ভাগই কেটেছে মহানন্দে, স্মৃতি আজও ভরা তারই মাধুর্যে। আমাদের কবিতা আর নাটকপাঠের সান্ধ্য আসরের কথা তো আগেই বলেছি। এবং সারা জীবন এই পথেই চলেছেন, সেটা যে খুব ভুল হয়নি তার নিদর্শন তাঁর নিজের জীবন। আর মাঝ থেকে আমার, আমাদের, তাঁর পরিবারের সবায়ের জীবন হয়েছে পূর্ণতর, হয়েছে আনন্দময়। এটা বিকাশবাবুর মৌলিক আবিষ্কার নয়, সেবিষয়ে

created using BCL easyPDF Printer Driver
Click here to purchase a license to remove this image

আমি নিঃসন্দেহ, তবে এর প্রয়োগটা যে তিনি খুব সুষ্ঠুভাবে করেছিলেন এটা অনস্বীকার্য।

আর দায়িত্ব। বিকাশবাবুর ধারণা ছিলো যে এই শিল্পে আস্তে আস্তে যখন শিক্ষিত, রুচিশীল মানুষেরা আসবেন, আচারে, ব্যবহারে, জীবনযাত্রায় প্রতিষ্ঠা করবেন এক সংযত, সুচারু পরিবেশ, তখন জনসাধারণের কাছে পেশাটি হবে সম্মানার্হ এবং পাবেন প্রাপ্য সম্মান। সেটি ঘটেছে কীনা তা আমি জানিনা। অন্যস্থান থেকে অবশ্য এই সম্মান আদায় করতে হবে, তার প্রথমটি হোলো সরকার। পঞ্চাশের দশকে বাংলা ছবির জগতে যাঁরা দিক্‌পাল ছিলেন তাঁদের বেশীর ভাগই এ ব্যাপারে বিশ্বাসী ছিলেন এবং অনেক কাজ করেছেন বলে আমার জানা আছে। যেমন ধরুন, এই বিনোদনশিল্প সরকারের তহবিলে অনেক অর্থ আনতো, পাঁচসিকের টিকিটের এক সিকি পেতেন সরকার, প্রমোদকর হিসেবে। তার বিনিময়ে, এই শিল্পটির সাধারণ উন্নতির সরকারের যে কিছু করা কর্তব্য, তখনকার মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধান রায়ের কাছে এনিয়ে দরবার করে তাঁরা কিছু কিছু সুবিধে আদায় করতে পেরেছিলেন বলে জানি। বিকাশবাবু এব্যাপারে পুরোধা ছিলেন কীনা জানিনা, তবে প্রথম সারিতে ছিলেন, এটা জানি।

তার পরের পর্ব হোলো সরকারের সম্মানস্বীকৃতি। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি ভারত সরকার ভারতীয় নাগরিকদের প্রতিভার স্বীকৃতি হিসেবে এক ক্রমবিন্যস্ত উপাধিদানের প্রথা প্রচলন করেন, যার শুরু পদ্মশ্রীতে এবং শেষ ভারতরত্নে। বিকাশবাবু, এবং তখনকার বাংলা চিত্রজগতের প্রায় সবারই ইচ্ছে ছিলো যে জাতির উন্নয়নে তাঁদের এই বিনোদন পেশাটির, সামান্য হলেও, কিছু অবদান আছে, এটি সরকার স্বীকার করবেন, চিত্রজগতেও কিছু অন্তত পদ্মশ্রী বিতরণ করে। বাংলা বিনোদনজগৎও তাতে বঞ্চিত হবে না। আমার দুর্ভাগ্যবশত আমার স্মৃতি এখানে ছলনা করছে এবং ইণ্টারনেটে খুঁজে পদ্মশ্রী উপাধিধরীদের তালিকা পাচ্ছি না। তবু বলি যে এই স্বীকৃতিটা দিতে সরকার কিন্তু অনেক দেরী করেছেন। ভারতরত্নের তালিকায় তো দেখি রাজনীতিকদেরই ভীড় বেশী। এ তালিকায় বিনোদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের প্রথম অনুপ্রবেশ ১৯৯২তে, সত্যজিৎ রায়ের মাধ্যমে। পদ্মশ্রী তালিকার হদিশ কারুর জানা থাকলে এবং আমাকে জানালে খুব উপকৃত হবো। মনে পড়ছে ১৯৫৯ সালে কানপুরে ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার খেলায় ভারত জিতেছিলো (বোধহয় অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এই প্রথম জয়), জেসু প্যাটেলের বোলিংয়ের গুণে, সরকার চট্‌জলদি তাঁকে পদ্মশ্রী উপাধি দেন। জেসু প্যাটেলের নাম এই ঘটনার আগে ও পরে আর শোনা যায়নি। এটা আমার মনে আছে যে তখনও কিন্তু বাংলা বিনোদনজগতের কেউ সরকারের স্বীকৃতি পাননি, এবং এই ঘটনা তাঁদের গভীর মনস্তাপের কারণ হয়েছিলো। অবশ্য তাতে কী হয়েছে, মহাত্মা ভারতরত্ন নন, টলস্টয় নোবেল পুরস্কার পাননি। কিন্তু এঁরা সাধারণ মানুষ, রবীন্দ্রনাথের মতো 'কেন আমায় মান দিয়ে আর দূরে রাখো' বলতে পারতেন না. অসম্মানেরই আসনে বসা এই মানুষগুলির দুঃখটা মেনে নেওয়া যায়। বিকাশবাবুরও এই দুঃখ ছিলো, আমার ধারণা যে মনে একটা আশাও রাখতেন যে হয়তো বেড়ালের ভাগ্যে একদিন শিকে ছিঁড়বে। 'দ্রাক্ষাফল টক' বলছেন তো। হতে পারে, আমার এ ব্যাপারে খুব একটা অভিজ্ঞতা নেই। জানি আজ সে ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে, বোধহয় বেশীর ভাগ পেশার অবদানই স্বীকৃতি পায় আজকাল। অন্তত এ খবরটাও বিকাশবাবুকে জানাতে পারলে ভালো লাগতো।

আগে বলেছি যে পিতা বিকাশবাবু ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছিলেন আমার কাছে; অভিনেতা বিকাশবাবু দ্বিতীয়। এখন দেখছি এসবটাই তাঁর কৌশল। পিতা আর অভিনেতার মধ্যে চমৎকার সংযোগসাধন করেছিলেন, তাতে তাঁর নিজের জীবনে এসেছিলো স্থিতি আর আমার জীবনে সমৃদ্ধি।

অন্য কারো কথা জানিনা, কিন্তু 'ভালো আমার লেগেছে যে রইল সেই কথাই'॥

created using BCL easyPDF Printer Driver
Click here to purchase a license to remove this image

১৯৮৬ – কোলকাতায় যোধপুর পার্কের বাড়ীতে

created using
BCL easyPDF
Printer Driver
Click here to purchase a license to remove this image